ব্রজের পথে

(উচ্ছ্বাস)।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ লিখিত

ও

রাজফুলবাড়িয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

১৩২৯ সন।

বিনামূল্যে বিতরিত।

ব্রজের পথে

(উচ্ছ্বাস)।

শ্রীপীযূষকিরণ চক্রবর্ত্তী বি, এ লিখিত

রাজফুলবাড়িয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

১৩২৯ সন।

বিনামূল্যে বিতরিত।

16.APR

182. Jd. 922. 1E(2)

ব্রজের পথে।

কোথায় সে দেশ, কোথায় সে চিন্ময় ভূমি, কোথায় সে প্রাণারাম রসধাম? যে দেশের পত্রে পুষ্পে মধু, যে দেশের জলে স্থলে মধু, যে দেশের আকাশে বাতাসে, কাননে প্রান্তরে, চন্দ্রে সূর্য্যে, ধূলির কণায় কণায় অনন্ত মাধুর্য্যের প্রস্রবণ বহিয়া যায়—যে দেশে আলোছাড়া আঁধার নাই, আনন্দ ছাড়া দুঃখ নাই, হাসি ছাড়া ক্রন্দন নাই—যে দেশে মৃত্যু নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই—অনন্ত যৌবন অনন্ত জীবন অনন্ত সৌন্দর্য্যে যে দেশ মণ্ডিত—ক্ষুধিত পাষাণের হাহাকার, শুষ্কতরুর মর্ মর্ ধ্বনি, ভগ্নপ্রাণের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস, ব্যর্থ জীবনের করুণ আর্ত্তনাদ যে দেশের শান্তির নীরবতাকে উপহাস করে না—প্রাণের পঙ্কিলতা, মনের দুর্ব্বলতা, দেহের কলঙ্ক যে দেশের ধূলিকণাকেও স্পর্শ করিতে পারে না, কোথায় সেই দেশ? কোথায় সেই আনন্দের রাজ্য? যে দেশের অধিপতি আনন্দ, যে দেশের প্রাণ অমৃত, যে দেশের স্বরূপ রসময়; কোথায় সে দেশ,—চির বসন্ত বিরাজিত, মোহন বংশী মুখরিত, আনন্দধারায় প্লাবিত, কোথায় সে দেশ? কত দূর? যে দেশের যমুনার তীরে বাঁশীর তানে গাভী চরে, তরু শাখায় শিখি ঝুরে, শুষ্কতরু মুঞ্জরে নব পল্লবে; কোথায় সে দেশ, কোথায় সে স্বপ্নের রাজ্য, কত দূরে, আর কত দূরে?

কত জন্ম জন্ম একইভাবে চলিতেছি ; কত যুগ, কত দিন, কত মাস, কত ঋতু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে ; কত মুখ পরিচিত অপরিচিত হাসিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছে ; কত শোক, কত দুঃখ অসহনীয় আঘাতে আমার এই অনন্ত জীবন ভাঙ্গিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছে ; কত সুখ কত আনন্দ আমার এই বিশাল হৃদয় উল্লাসের তরঙ্গে নৃত্য-চঞ্চল করিয়াছে। এই অনন্ত জীবনে—এই অনন্তের পথে কত জনার সন্তান, কত জনার স্বামী, কত জনার ভ্রাতা-ভগ্নী আমি হইয়াছি ; আর কত জনাই বা আমার সন্তান, স্বামী ও ভাই ভগ্নী হইয়াছে ; কত আত্মীয় অনাত্মীয়, বন্ধু বা শত্রু আসিয়াছে গিয়াছে। কত দেশ, কত নদ, কত নদী, কত গিরি-দরি, উপত্যকা, কত কান্তার প্রান্তর, কত কুঞ্জ, কত গান পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। চলেছি চরণে স্বপনে জীবনে সীমাহীন পথ বহি—কোথায় এ পথের শেষ, কোথায় কবে এ যাত্রার অবসান ? কতদিনের কথা, আমার মনে নাই ; কত লক্ষ কত কোটি জন্ম চলিয়া গিয়াছে তা'তো জানি না ; কত কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমার এ অসীম যাত্রা চলিয়াছে, আজ আর তাহা মনে করিতে পারি না। শরীর আমার অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, আর চলিতে পারি না, স্কন্ধে আমার এই বিরাট কর্ম্মের বোঝা ; আর ভার বহিতে পারি না ; এত জন্ম জন্মের কর্ম্মাকর্ম্মের রাশিকৃত পুটুলী, বৃদ্ধ আমি আর এ ভার সহে না। হাত পা আমার কাঁপে, দেহ আমার অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা ভাবিয়া দেখ কত কোটি বৎসরের বৃদ্ধ আমি, আর যে পারি না। আমার এ ভার কে বহিবে, কে আমার হাত ধরিয়া আমায় সেই স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে—কত দূর,—আর কত দূর ? এস, এসহে চঞ্চল চপল,

চাঁরুচকিত চক্ষু, চন্দনের অবলেপে লিপ্ত করিয়া আমার এই ভারাক্রান্ত হৃদয় গ্রহণ কর ; এস, এসহে কমনীয় কান্তি ব্রজরমণীরমণ, আমার হৃদয়মন বিমোহিত করিয়া সেই আনন্দ ধামের বার্ত্তা জ্ঞাপন কর ; এস, এসহে সুন্দর নটবর সুস্মিতবদন, নব জলদাঙ্গ অনঙ্গ সেবিত শ্যাম সুন্দর, এস বৃন্দাবন চন্দ্র কুঞ্জকাননচারী—চির বসন্তের কোকিল, এস বংশীধারী, বাজাও তোমার মোহন বাঁশরী, যার তানে পাষাণ গলিয়া যায় শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয় ; যার গান পবন রহিয়া রহিয়া শ্রবণ করে, গগনের স্তরে স্তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে, যার গানে বিমোহিত বিশ্ব স্তব্ধ হইয়া যায়, যে সঙ্গীতের রেশ শ্রবণ করিয়া ধ্যানী ধ্যান ছাড়ে, গৃহী গৃহ ছাড়ে, হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়া যায়, গাভীগণ যার তানে মুখের কবল ফেলিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকে, বৎস মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়া আপন-হারা হইয়া যায়, যার মঙ্গলনিদানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যাহার মোহন ঝঙ্কারে যমুনা উজান বহে ; আমার হৃদয়-যমুনার কূলে দাঁড়াইয়া একটী বার তান ধর, একটী বার বাজাও তোমার সেই বাঁশী, চিরজন্মের মত দাসী হইয়া যাই ঐ চরণে, চিরদিনের জন্য ধরা দেই ঐ নয়নে। ওহে সুন্দর, ওহে মনোহর, ওহে নটোবর, বাজাও বাজাও তোমার সাধা বাঁশী। বাজুক, আবার বাজুক তোমার বাঁশী! চিরদিন—সেই অনাদি কালের আদি হইতে তোমার বাঁশীতো বাজে, যে শোনে সেই শোনে ; যার কাণের কাছে তোমার বাঁশী ধরা দেয়, সেই শোনে, সেই জানে কি বলে তোমার বাঁশী, কি চায় তোমার প্রাণ। আমি শুনি নাই, আমি জানি না ; মাঝে মাঝে শুধু একটু রেশ একটু ঝঙ্কার বাতাসে ভাসিয়া আসে, এদিক সেদিক চাই,

কোথাও না পাই, কে বাজায়, কি বাজায়, কি বা চায় সে। আজ এই পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া ব্যর্থ জীবনের হতাশায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে; কি করিয়াছিস্ রে অবোধ, তুই কাঞ্চন ফেলিয়া জনম ভরিয়া কি কেবল কাঁচই কুড়াইয়াছিস্? সে কাঁচের আঘাতে যে তোর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, সে কাঁচের ভারে যে তুই ভারাক্রান্ত। আজ চাহিয়া দেখ,—সম্মুখে তোর কত দীর্ঘ পথ; আর পেছনে ঐ যে ঘন মসী রেখার মত তোর দীর্ঘ পথের রেখা আঁধারে মিশিয়া যাইতেছে। শ্রান্ত পথিক, হাল ছাড়িয়া দিলে তো আর গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না, ঐ শোন বাঁশী, চল দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ উদ্যমে ঐ বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, ঐ বৃন্দাবনের পথ—মনে রেখো—ভুলো না ঐ বাঁশীর তান লক্ষ্য কর,—ঐ দেখা যায় আনন্দধাম,—মহা জ্যোতির্ম্ময় চিন্ময় ভূমি। ঐ প্রেমভূমি, ঐ ব্রজধাম; ঐ ধামেই আমাদের যাইতে হইবে, ঐ ধামই জীবের শেষ বিশ্রামাগার। ঘোর জীব যত ঘুরিতে পার, কাটাও তুমি যত বৃথা কাজে সময় কাটাইতে পার, গোঙাও তুমি কত জন্ম গোঁয়াইতে পার; কিন্তু তোমার শেষ পরিণতি, ঐ ব্রজধামের চিন্ময় রজের সঙ্গ, একমাত্র আশ্রয় তোমার ঐ ব্রজধাম, ঐ চিন্তামণি ধামের চির শান্তিময় ক্রোড় দেশ। যতই কেন এদিক সেদিক যাও না,—অসংযত অশ্বের মত, রাখালবিহীন গাভীর মত বিপথে কুপথে গমন করিয়া দুর্ল্লভ সময় নষ্ট কর না কেন, তুমি না জানিতে পার, কিন্তু একজন ঠিক জানেন, তোমার পথ একমাত্র ব্রজের পথ। কত কোটি বৎসর কাটাইয়া দিয়াছ আরও না হয় কয়েক কোটি কাটাইবে, নাচ আর হাস, কাঁদ আর মর, ঘোর আর ফির তোমার কিন্তু যেতেই হবে ঐ পথে,

গাইতে হবে ঐ গান; কাঁদতে হবে ঐ বিরহের কান্না, নাচ্‌তে হবে প্রেমের আনন্দে,—এই তোমার পথ, এই তোমার একমাত্র গতি। তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া তোমার নিজের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া চল যত পার, তোমার নিজের মত মত কর যত কাজ তোমার আছে, কিন্তু একদিন আসিবে, আজ বা কাল নিশ্চয় সেই দিনের দেখা পাইবে, এক আঘাতে বা আঘাতের উপর আঘাতে যে দিন তোমায় বুঝাইয়া দিবেন এ তোমার পথ নয়, এ কাজ তোমার নয়। চাবুকের উপর চাবুক মারিয়া, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন, বুঝাইয়া দিবেন, হায়রে অবোধ, যে পথে চলিয়াছিস এ পথ তোর নয়। এ ভাবে দিন যায় না রে যায় না, চাহিয়া দেখ্‌ আজ এই নির্ম্মল প্রভাতে চাহিয়া দেখ্‌ পিছনের দিকে তোর সমস্ত পথ বৃথাই আসিয়াছিস; চাহিয়া দেখ আপন অন্তরের অন্তরে কত জন্ম জন্মের সঞ্চিত কাহিনী তোর এমন জনম কে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে; যাহা করিয়া আসিয়াছিস্, কাজের মত কাজ একটীও হয় নাই, আবার নূতন করিয়া কর্ম্মের আরম্ভ হইবে, নূতন পথে চলিতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেক জন্মেই কথার মত কথা কত শুনি, ব্যথার মত ব্যথা কত পাই, কথা শুনিতে শুনিতে, ব্যথা পাইতে পাইতে একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে এমন কথাই শুনিব, এমন ব্যথাই পাইব যে এক পলকে আমার সমস্ত জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, সমস্ত জীবনের ধারা বদলাইয়া যাইবে। একদিন না এক দিন সে ক্ষণের দেখা প্রত্যেক মানবকেই পাইতে হইবে।

আপনারা বোধ হয় সকলেই বিল্বমঙ্গলের কথা জানেন। চিন্তামণিকে ভালবাসিতে বাসিতে বিল্বমঙ্গলের আপন ভুল হইয়া

গেল ; তিনি চিন্তামণি ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না, চিন্তামণি ছাড়া কিছু দেখিতেন না, দেহাত্মবোধ গেল, নিজের দিকে দৃষ্টি নাই ; মান গেল অপমান গেল, জগতটা পর্য্যন্ত ভুল হইয়া গেল, থাকিল কেবল চিন্তামণির মত চিন্তামণি ; চিন্তামণি ধ্যান, চিন্তামণি জ্ঞান, চিন্তামণি কর্ম্ম।

সেদিন পিতার শ্রাদ্ধের দিন, বিল্বমঙ্গলকে চিন্তামণির বাড়ী হইতে আনাইয়া স্নান করাইয়া শ্রাদ্ধের আসনে উপবেশন করান হইল, শ্রাদ্ধের আসনে বসিয়াও বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলেন না। কোনও প্রকারে যা'তা' করিয়া শ্রাদ্ধ শেষ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয় ; আবার সে দিন কি ভীষণ দুর্য্যোগ করিয়াছে, বাতাস পাগলের মত নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, কড়্ কড়্ করিয়া বিদ্যুৎ গরজিয়া উঠিতেছে। এই ভীষণ দুর্য্যোগে বিল্বমঙ্গল শ্রাদ্ধান্তে নদীতীরে দাঁড়াইয়া। পারের এক খানা নৌকাও নাই, এ তুফানে কে আর ঘরের বাহির হয়, কে আর পারের ঘাটে নৌকা রাখে? বিল্বমঙ্গল ভাবিতেছেন, ঐ না কাঠের মত কি একটা দেখা যায়, না না কাঠ নয়, হাঁ ঐতো ঢেউএর মাথায় দেখা যাইতেছে ; বেশ হইয়াছে এ কাঠখানা অবলম্বন করিয়াই নদীটা পার হইয়া যাই। দয়াময়ের কৃপায় ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, আর শরীরেও জোরটা কিছু কম নেই, পুর্ব্বপুরুষেরা হেঁটেই নদী পার হতেন, আর আমি এই গণ্ডাপিণ্ডা শরীরটা নিয়া কি সাঁতরে নদীটা পার হতে পারব না? দে ঝাঁপ নদীতে। বিল্বমঙ্গল নদীপার হইলেন, কি ধরিয়া? সেটা কি কাঠই না আর কিছু সে জ্ঞান তাঁহার নাই। তখন রাত্রি হইয়াছে, আর এই দুর্য্যোগের দিন, চিন্তামণি সকাল

সকাল সকাল দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। সে হতভাগা এই ঝড় বাদলের রাতে আজ আর আস্‌বে না। এদিকে সে হতভাগা এমনই বেয়াড়া, বেহদ্দবেহায়া যে ঠিক হাজির। হায় হায় দেউরীতো বন্ধ; কি উপায় হবে, কি করি? ঐ যে প্রাচীরের উপরে ঝুলান এক গাছা দড়ি দেখা যায় না? ঠিক, দেখ চিন্তামণি কি ভালটাই বাসে আমায়, যেতে হবে তাই মণি এই দড়িগাছা রেখে দিয়েছে। সেটা দড়ি না সাপ বিল্বমঙ্গলের মোটেই ধারণা নাই। সেইটা অবলম্বন করিয়া তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। তারপরে এক দৌড়ে চিন্তামণির ঘরে। মণি, মণি, ও মণি, চিন্তা অ চিন্তা, হ্যাঁগা শুন্‌তে পাচ্ছ? ওঠ, দোর খোল, আমি এইচি; আমি—ওগো আমি বিলু। চিন্তামণি দ্বার খুলিলেন বিস্ময়ে আকুল হইয়া চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভক্‌ ভক্‌ করিয়া কিসের পচাগন্ধ তাঁহার নাকে গেল। কি তুমি, কিসের এ গন্ধ, সরে দাঁড়াও, কেমন করে এলে তুমি; ভূত না প্রেত! নাগো আমি বিলু। বিলু! এই রাতে; কি করে নদীপার হলে? দেউরী বন্ধ, কি করে বাড়ী ঢুক্‌লে? বিলু! অসম্ভব। হ্যাঁগো হ্যাঁ আমি বিলুই। বিলু! কি করে এলে তুমি, এ কিসের গন্ধ তোমার গায়ে? ভারী বিচ্ছিরী গন্ধ, ছি, ছি, ছি। আরে আগে শোন, তারপর বলো। নদীর ধারে এসে দেখি ভারী ঝড়, একখানা বড়কাঠ ভাস্‌তে দেখ্‌লাম, কি ভাগ্যি আমার মণি, সাঁত্‌রে সেই কাঠখানা ধরে নদীপার হওয়া গেল, তারপর এসে দেখি তোমার দেউরী বন্ধ, পাচীলের দিকে নজর পড়তেই দেখ্‌লাম একটা মস্ত দড়ি ঝোলান; তুমি রেখে দিয়াছিলে, নয়? তুমি বড্ড ভালবাস আমায়, নয়? আর থাক, কি যে বল তুমি! আরে শোনই,

তা'পর সেই দড়িটা ধরে পাচীল টপ্‌কে একেবারে হুজুরে হাজির; বল্ মণি, তুই আমায় এম্নি ভালবাসিস্। আরে রাখ, পাগলামী পরে হবে, চল দেখে আসি কেমন তোমার দড়ি আর কেমন তোমার কাঠ।

বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামণি তখন সেই দুর্য্যোগে বিদ্যুতের আলোকে প্রাচীরের পার্শ্বে দেখিতে পাইলেন একটী মৃত সর্প, আর নদীসৈকতে দেখিতে পাইলেন একটী গলিত শবদেহ! চিন্তামণি স্তম্ভিত, বিস্ময়ে আকুল।

"তুমি মানুষ, এত ভালবাসা তোমার ভিতরে! যে ভালবাসায় যে অনুরাগে আজ তোমায় এই জগৎটা ভুলিয়ে দিয়েছে! এত বড় অনুরাগ, এত গভীর ভালবাসা, এত বড় প্রাণ, ছার একটা পতিতা নারীর পায়ে অঞ্জলি দিবার জন্য? ধিক তোমাকে, দূর হও তুমি আমার কাছ থেকে, চাই না তোমায় আমি। ক্ষুদ্র নারী আমি, এত উদ্দাম ভালবাসার প্রতিদান আমার কাছে নাই। নির্ব্বোধ, ফিরে যা, যে ভালবাসা তুই আমার পায়ে সঁপেছিস্ তার এক কণাও যদি ভগবানকে দিতে পারতিস্ ধন্য হয়ে যেতিস্ অধম। দূর হ' অন্ধ, আর আসিস্ না তুই আমার কাছে।"

সেই অন্ধকার রজনী, কি ভীষণ অন্ধকার হইয়া উঠিল আজ বিল্বমঙ্গলের নয়নে। ঐ নদীর উদ্দাম কল্লোল, ঐ বাতাসের সন্ সন্ শব্দ, ঐ বজ্রনাদ, কি ভীষণরূপে আজ আঘাত করিল তার হৃদয়ে। বিল্বমঙ্গল, শুনিতে পাইয়াছ? ঐ বজ্রের মতই ভীষণ হইয়া ঐ নারী তোমার আদরের ধন হৃদয়ের মণি, নয়নের পুতুলী কি বলিয়া গেল তোমায়? এরই নাম আঘাত, এরই নাম ভগবানের

চাবুক। মহাভাগ্য তোমার, আজ মাথা পাতিয়া লও তাঁর এই শ্রেষ্ঠ দান।

তোমার মত আমাদেরও এই চাবুক খাইতে হইবে; আজ বা কাল, এ জন্মে বা পর জন্মে আমাদেরও এইরূপ আঘাত, দয়াময়ের এই শ্রেষ্ঠদান লাভ করিতে হইবে। জীব, সেজন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থেকো। ঐ যে তোমার নয়নানন্দ নন্দন, ঐ যে তোমার হৃদয়ানন্দ নন্দিনী, ঐ যে তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী, একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে জানাইয়া দিবে, বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির মতই পায়ে দলিয়া হৃদয় মথিত করিয়া ছাড়িয়া যাইবে, বলিয়া যাইবে তোমার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই, বৃথা তুমি আপন মনে করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলে। অবোধ মন আমার, একবার, একটী বার শুধু যদি তোমার আপনার হইতেও আপন যে তাঁহাকে চাহিতে, তাঁহাকে ভালবাসিতে, তবে তোমার জীবন আজ হাহাকারে ভরিয়া যাইত না।

আজ নয়নের জলে পথ দেখিতে পাও না, আজ সংসার তোমার কাছে অন্ধকার! মন আমার শোন্ ঐ বাঁশী বাজে মনোমাঝে কি বনমাঝে। ঐ দেখা যায় আনন্দধাম, নিত্যধাম, ব্রজধাম, চিন্ময় রসময়ধাম। রে নয়ন, তুই-ই তো মানুষকে বিপথে চালাইবার এক প্রধান দ্বার, তুই-ই মা নারীর রূপে—মানুষের রূপে—এই বিশ্বের বাহিরের রূপ দেখাইয়া আমায় পাগল করিয়াছিলি। সেই অরূপের রূপ, যাঁর রূপে এই বিশ্বের রূপ-সৃষ্টি, যে রূপের এক কণায় এই বিশ্ব এমন সুন্দর মনোহর, তুই আমায় সেইরূপে তন্ময় হইতে দিলি না। মন! তোর মনে যা ছিল তা'তো করিয়াছিস; কত অধঃপাতের পথে আমায় পরিচালিত করিয়াছিস কত

কামনায় বাসনায় আমার হৃদয় কলঙ্কিত করিয়াছিস্। আর কেন? এ আঘাতেও কি তোর শিক্ষা হইল না? আঘাতের উপর আঘাত, বেদনার উপর বেদনা, শোকের পর শোক, দুঃখের পর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ আসিয়া আজও কি তোকে বুঝাইতে পারিল না, ওরে তুই ভুলপথে চলিয়াছিস্, ওরে তোর সমগ্র শ্রম পণ্ড হইয়াছে, তোর সমস্ত কাজ অকাজ হইয়াছে, তোর এমন জনম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

"নারি, এই আমার সেই চোখ যে চোখে তোর রূপ তোর যৌবন আমায় পাগল করিয়াছিল, আমার এত সাধের জনমটা বিফল করিতে চাহিয়াছিল, রে চক্ষু, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। এই দ্যাখ্ এই তপ্ত লৌহ শলাকা! স্থির হ', পলক ফেলিস না, এই-ই —— যাঃ। চা' ভিতরের দিকে; এবার তোর বাহিরে চাওয়ার পথ রুদ্ধ করিলাম আর আমায় নারীরূপে মজাইতে পারিবি না, আর রূপজমোহে আমায় উন্মাদ করিবে না। নয়ন, চাও ভিতরে, অন্তরের অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, ঐ ঐ মণিকোঠায় কোটি মাণিকের দ্যুতি লইয়া বিরাজিত আমার জগন্নাথ; ঐ দেখ্ আমার হৃদয় কদম্বের তলে ব্রজের গোপাল নন্দের দুলাল, অন্ধের নয়ন।

রে শ্রবণ, তুই নারীর কণ্ঠে ভুলিয়াছিলি, শিশুর আধ আধ কণ্ঠে আত্মহারা হইয়া যাইতি, কুগানে কুকথায় তোর প্রীতি ছিল; আজ তোরও নিস্তার নাই। এই ——, চিরজন্মের মত রুদ্ধ করিলাম তোর পথ। আজ শোন্ ভিতরে —"মহাসাগরের ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে আসে ভেসে"—ঐ শোন্ অনাহত ধ্বনি, ঐ শোন্ "যমুনার তীরে চলু ব্রজনন্দন, মন্দ মধুর বেণু বায়"।

রে স্পর্শ, কামিনীর কমনীয় দেহ পরশ করিয়া তুই বিহ্বল হইয়া যাইতি, এই যা—আজ চিরদিনের মত নষ্ট করিয়া দিলাম তোর বাহ্য স্পর্শশক্তি। স্থির হইয়া বসিয়া থাক্। যদি কোন দিন সেই যদুনন্দন, প্রাণের গোপাল, ভাই কানাই, প্রাণরমণ বল্লভের দেখা পাই, যদি কোন দিন কৃপা করিয়া এ দরিদ্রের কুটির তার আগমনে ধন্য হয়। সেইদিন জড়াইয়া ধরিস তাঁহাকে,—তোর আকুল প্রাণের সমস্ত আবেগে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হোস্। যা'দের স্পর্শে তাঁ'কে ভুলায় সে স্পর্শ যেন তোর ভাগ্যে আর না ঘটে।

মন আমার আজ চল সেই বৃন্দাবনে। তুমি না এক মুহূর্ত্তে সহস্র যোজন অতিক্রম করিতে পার, তিলমাত্র সময়ে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসিতে পার! দেখাও ভাই মন, তোমার সেই শক্তি। আজ শ্রীধাম আমায় আহ্বান করিতেছেন, আরতো স্থির থাকিতে পারি না; প্রাণতো আর বাধা মানে না, চরণ উশৃঙ্খল উদ্দাম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; উল্লাসে হৃদয় নাচিয়া উঠিতেছে, পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। চল মন চল বৃন্দাবন। পবনের গতিতে, পাগলের মত, ঝড়ের বেগে চল, চল মন বৃন্দাবন। তোমায় বাধা দিতে পারে আজ আর তো তেমন কেহ নাই, তোমায় পেছনে টানিতে পারে এমন কোন শক্তিকেই তো জীবিত রাখিয়া আসি নাই। গাও মন "ও ভাই নিতাইরে আর কতদূর মধুর বৃন্দাবন;" আবার গাও "মন জানি আজ করে রে কেমন, কবে যাবরে সেই বৃন্দাবন; কবে রাধারাণীর কৃপা হবে পাবরে সেই প্রেমধন॥" সেদিন আমার কবে হবে, ওগো সে দিনের আর ক'দিন বাকী। আর কতদূর বৃন্দাবন! কোথায় সেই যমুনা

পুলিন, রাখালের মেলা রাখালের খেলা, "যার বিশাল তটে রূপের হাটে বিকা'ত নীলকান্তমণি।" রূপের রাণী কলসী কাঁখে সাঁঝের বেলা যায়রে জলে, ওঠে ধ্বনি রণ্‌ রণিয়া কিঙ্কিণীরই মধুর বোলে। যার জলের তলে মাণিক জ্বলে পরশ লাভের আশে,—কোথায় সে যমুনা, কোথায় তার নীল জল, যে জল নীলকান্তমণিকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। কোথায় সে যমুনার তট, চাঁদের মেলা। গোচারণ, হাসির খেলা, ছুটাছুটি, কাঁধে চরা। কোথায় সে বংশীবট, যার মূলে হেলে দুলে, দাঁড়াত শ্যাম বংশীধারী, কোথায় শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কোথায় গো সেই তালবন তমালবন ভাণ্ডীবন।—চল, চল মন বৃন্দাবন।

"অতি দূরে বুঝি সই বাজে অই বঁধুর মধুর মুরলী"—
(তোরা শ্রবণ পাতিয়ে শোন্‌গো ধনি)।

মন স্থির হও, শ্রবণ আজ এ কি ধ্বনি শুনিতেছ; ঐ মুরলী ধ্বনি। কি মধুর, কি মধুর, কি মধুর; হৃদয়ের প্রত্যেকটী তন্ত্রীতে কি মধুর স্পর্শ, কি করুণ কি কোমল কি মনোরম! আজ আমার শরীর মন অবশ হইয়া আসিতেছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেছে, পায়ের তলে পৃথিবী যেন গলিয়া খসিয়া পড়িতে চায়। ঐ শোন, ঐ বাজে—"আয়, আয়, আয়।" আর কাহারও বাঁশীতেতো এমন মধুর বাজে না, প্রাণের তারে এমন ভাবে আঘাত করে না, অনাস্বাদিত অমৃতের মত, অফুরন্ত সহস্র ধারার মত, হিমালয়ের বক্ষোভেদী মন্দাকিনীর প্রবাহের মত, সমস্ত প্রাণ মন গলাইয়া এমন করিয়া স্বপ্নের ছবি অঙ্কিত করে না। বাজ আবার বাজ—"আয় আয় আয়"। বিচার করিয়া দেখতো শ্রবণ, এমন ধ্বনি আর শুনিয়াছ কি; এতদিন সংসারের পথে বিচরণ করিয়া

আসিয়াছে, কত মধুর ধ্বনিই তোমার কুহরে ধ্বনিত হইয়াছে, কত রমণীর কণ্ঠ, কত শিশুর আধ আধ বুলি, কত আনন্দের কলহাস্য, কত পাখীর কূজন, কত তটিনীর কুলকুলধ্বনি, কত যন্ত্রের মধুময় মোহন সুতান। বিচার করিয়া দেখ এমন ধ্বনি আর কখনও তোমার পটহে আঘাত করিয়াছে কি না। কি আর বিচার করিবে বল, কার সঙ্গে তুলনা আর করিবে বল।— এ যে অনাস্বাদিত অভূতপূর্ব্ব, নিরবস্থ। পৃথিবীর সঙ্গীতে, ইহ জগতের ধ্বনিতে তোমায় বিস্ময়ে ও পুলকে আকুল হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু আপন হারা পাগল হইতে দেখি নাই। এ যে তোমার সমাধি।

"অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি
লালসা বাড়ল শব্দ শুনি"।

বলতো সখি, এমন করিয়া কে আমায় ডাকে, এমন করিয়া কে মুরলী বাজায়; একি মানুষে বাজায়, তা'তো নয় সখি, বংশীধ্বনি তো অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এমনটী আর শুনি নাই। বলতো এ তান শুনিয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া থাকি, কেমন করিয়া কুলমান রাখি! একি মানুষে বাজায়! না না। আনন্দে আমার মন নাচিয়া উঠিয়াছে। কে বাজায় জানিতে হইবে। আমার সর্ব্বস্ব বিনিময়েও যদি সে বংশীবাদকের দেখা পাই।

চল মন চল, ঐ বৃন্দাবনের ধ্বনি,—ঐ বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজিয়া দেখিব, পাতায় পাতায় লতায় লতায় খুঁজিব,—যদি সে বংশীধারীর দেখা পাই। তোরা একটী-বার আমায় দেখাতে পারিস? ব্রজবাসী, ব্রজমায়ী, ব্রজের রাখাল আমায় দয়া কর; একবার বলিয়া দেও কোথায় সে বংশীবাদক।

ওযে বাঁশীর তানে আমার মনপ্রাণ চুরি করিল,—আমার পাগল করিয়া দিল।—

——কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া।
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারীতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়য়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাই যে ওর।"

এইতো বৃন্দাবনে আসিলাম, মধুর মুরলী আমার কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আমায় চির বাঞ্ছিত ধামে আনয়ন করিল। আরতো বাঁশী শুনিনা, কোথায় হে তুমি মুরলীধর? কোন্ বনে তুমি থাক? শুনিয়াছি বৃন্দাবন তোমার নিত্যধাম, তোমার মধুর লীলাস্থল, তোমার প্রেমরসের মূর্ত্তিমান বিলাস স্থল। বলিয়া দাও ঠাকুর! কোথায় গেলে তোমার সাক্ষাৎ লাভ হইবে? কোন্ কুঞ্জে তল্লাস করিলে তোমার সন্ধান পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি তোমার লীলা নিত্য, চিরকাল সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আজও কি তুমি কোকিলের কুহুতানে, গাভীর হাম্বারবে, ব্রজবালকদের— তোমার সেই শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম সুবল মিতার আহ্বানে, তোমার বলাই দাদার শিঙ্গাধ্বনিতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হও? আজও কি তেমনই মা যশোদা পিতা নন্দ মনের সাধে তাঁহাদের প্রাণের গোপালকে চন্দন তিলকে সাজাইয়া, ক্ষীর সর নবনী অঞ্চলে

বাঁধিয়া দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গোষ্ঠে প্রেরণ করিয়া থাকেন? ‘দূরবনে যাস্‌না’ ‘মধ্যাহ্নে প্রখর রবির তাপ সহিতে পারিবি না। বাছা, তরুর তলায় বিশ্রাম করিস, কখনো বাপ পালের বড় ধেনুর কাছে যাস না।’ ‘বনে থাকিয়া বেণুধ্বনি করিস আমি যেন বাড়ী হইতে তাহা শুনিতে পাই, আর বাছা সকাল সকাল সন্ধ্যা না হইতেই পাল জড় করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিস’ প্রভৃতি স্নেহের বাক্যে তোমায় বনে প্রেরণ করিয়া থাকেন? আজও কি তেমনই হৈ হৈ করিয়া রাখালবালকদিগের সঙ্গে তুমি রঙ্গে যমুনাতীরে গমন করিয়া থাক? তাহারাও কি পূর্ব্বের মত তোমায় ভালবাসিয়া তাহাদের অর্দ্ধভুক্ত ফল প্রদান করে, তোমার কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়? তোমার বলাই দাদার চক্ষে ধূলা দিয়া আজও কি তুমি বংশীবটের তলে ত্রিভঙ্গ হইয়া তেমন করিয়াই বাঁশী বাজাও আর বিনোদিনী রাধা সেই মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া আপন হারা হইয়া এলোথেলো বেশে পাগলিনীর মত তোমার অভিসারে গমন করেন? আজও কি ভাই কানাই না হইলে ব্রজবালকদের গোঠে যাওয়া হয় না, আজও কি তোমার ধবলী শ্যামলী তুমি না খাওয়াইয়া দিলে আহার করে না? আজও কি মা যশোদা, মা রোহিণী তাঁহাদের প্রাণের কানাই বলাইকে তেমন করিয়াই গোষ্ঠান্তে আরতি করিয়া থাকেন, তেমন করিয়াই ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিয়া তোমাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া যান?

যদি তাই হয়, যদি তেমন লীলা আজও এই ধামে হইতে থাকে, তবে ঠাকুর এক দিনের জন্যও কি তোমায় পাইব না? এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি তোমায় সখা বলিয়া, পুত্র বলিয়া, কান্ত বলিয়া হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিতে পারিব না? ঠাকুর, আজ যে

আমার তোমা বিহনে এই জগৎ শূন্য মনে হইতেছে, নয়ন জলে ভরিয়া আসিতেছে, এক নিমেষ যে আমার কাছে শত শত যুগের মত মনে হইতেছে। ওগো আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না? আমার এ জীবন কি ধন্য হইবে না?

আমার জীবনের দিনগুলি যে বৃথাই গিয়াছে, আমার সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান, সকল ভালবাসা যে বিফল হইয়াছে। যে দিন তোমার অদর্শনে আমি যাপন করি সে দিন যে আমার ফাঁকা যে কাজে তোমার কোনও কাজ হয় না, সে কাজ যে আমার নিরর্থক, যে জ্ঞান তোমার সন্ধান না করে—তোমার দর্শনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না করে, সে জ্ঞান তো বিফল জ্ঞান।

"বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণা কড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সে শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত
সুধাসার স্বাদ্ বিনিন্দন।
তার স্বাদ্ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥

মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ কর পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার
সেই বপু লৌহ সম জানি।"

আমার সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমায় অনুভব করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমার এই সকল ইন্দ্রিয় বৃথাই সৃষ্ট হইয়াছে। ওহে মদনমোহন একবার দেখা দাও; আমার এ কাম কলুষিত ইন্দ্রিয় তোমার স্পর্শে ধন্য হউক, ধন্য হউক। হে নাথ, হে রমণ, হে জগবন্ধু, করুণার সিন্ধু, তুমি একটীবার কৃপাবলোকন কর, জনম সফল হউক। হে বৃন্দাবনের তরুলতা, তোমরা তো পুলকে নৃত্য করিতেছ, এত আনন্দ তোমরা কোথা হইতে পাইলে? আমার আনন্দময় হরি কি তোমাদের পরশ করিয়াছেন, তাই তোমাদের এত উল্লাস, এত শিহরণ! তোমাদের কাছে কি তিনি আসিয়াছিলেন; তোমরা কি আমায় তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিতে পার? ঐ যে ছোট ছোট তরুগণ মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কাহাকে আহ্বান করিতেছে, ঐ যে বৃক্ষরাজি মাথা নত করিয়া কাহার আগমন বা গমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে; এই পথে কি ব্রজের গোপাল গোঠে যাইবেন, ওগো বল, এই পথে রহিয়া আমি কি তাঁহার দেখা পাইব। নয়ন, দেখ দেখ, ঐ শ্যামলী

ফুল, কানাই বুঝি এই পথেই যাইবে, তা'র তো বড় কোমল চরণ, কঠিন কঙ্করে ক্ষত বিক্ষত হইবে বলিয়া পথের উপরে আজ এই কুসুমশয্যা। অথবা গোপাল আমার নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, ঐ যে মধুবর্ষণ তাঁর শ্রীচরণের উদ্দেশে. ঐ যে কুসুমবর্ষণ তার পূজাচ্ছলে। মরি, মরি, শাখীর শাখায় ও কিসের গান সমস্ত বনভূমি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে? শারী, শুক, পিকের আজ এত আনন্দ কেন? এ ত বন্দনা-গীতি, আত্মদানের মধুময় মোহন সুতান। বল বল শারী, বল শুক, এই পথে কি নন্দের দুলাল কানন প্রবেশ করিয়াছেন, বল এই বনে কি শ্যামসুন্দরের দেখা পাওয়া যাইবে?

ঐ দেখ নয়ন ময়ূরের নৃত্য, শিখি কেমন পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত করিতেছে, আজ আকাশে তো এক বিন্দু মেঘও নাই, মেঘ দর্শনেই তো শিখি নাচিয়া থাকে, তবে আজ উহার এ ভাব কেন, কেন এ উল্লাস, কেন এ নর্ত্তন? তুমি জাননারে মন জান না, নব জলদাঙ্গ, শ্যামতনু দর্শন করিয়া আজ উহার এই আনন্দ। মেঘ দেখিলেই উহার সেই শ্যামজলধরের কথা মনে পড়ে, মেঘের কোলে ওযে তাঁকেই দেখে তাই যখনই ও মেঘ দেখে তখনই আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। আজ আরতো মেঘ নাই; নিশ্চয়ই ময়ূর আজ গোপালের দর্শন লাভ করিয়াছে। বল ময়ুর, বল ময়ূরী, কতদূরে তিনি গিয়াছেন, আমার ভাগ্যে কি তাঁর সঙ্গলাভ ঘটিবে না? ধন্য ব্রজের তরুলতা, ধন্য ব্রজের পশুপক্ষী, ধন্য ব্রজবাসী, ব্রজমায়ী, তোমরা পাইয়াছ প্রাণরমণ চাঁদবদনে তোমরা পাইয়াছ তাঁর সেবাধিকার, পাইয়াছ চিরমনোর

ব্রজের রজঃ তোমায় নমস্কার, গোপালের পদরজঃ তোমার বক্ষে রহিয়াছে ; গোপালের পদস্পর্শে আজ তোমায় অচেতন করিয়াছে ; এস এস হে ধূলি, তুমিতো ধূলি নও—আমার হিয়ার মলয়জপঙ্ক, আমার হৃদয়নলীনের চিরবাঞ্ছিত পরাগ। এস, তোমায় দেহে ধরিয়া হৃদয়ে ধরিয়া আমার প্রাণমন শীতল করি।

কৈ রে ব্রজের রাখাল, দে ভাই একটী বার দে, তোদের প্রানের ভাই কানাইকে স্কন্ধে করিয়া নাচিয়া বেড়াই। কৈ মা ব্রজমায়ী, একবার দে মা তোদের দুধের বাছাকে, আমি কোলে করিয়া ধন্য হই।

পেলাম নারে পেলাম না, কাহারও দয়া হইল নারে হইল না। হা কৃষ্ণ, হা দয়িত।

কতদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গিয়াছে, নয়নের জল অঝোরে ঝরিয়াছে, বক্ষে আমার তুষের আগুন জ্বলিয়াছে. কত ডাকিয়াছি, তোমার পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন আমার অন্ধ হইয়া আসিয়াছে, কতদিন যমুনার কূলে বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়াছি, ডাকিয়াছি, তুমি এস নাই বন্ধু, এস নাই। কত বন উপবন, কত কুঞ্জ কত বীথি, কত কানন প্রান্তর, কত গোচারণস্থল খুঁজিয়াছি পাই নাই বন্ধু, তোমায় পাই নাই। তুমি মাখন চোর ননী চোর, তাই কত গোপিনীর কক্ষ অনুসন্ধান করিয়াছি ; তুমি রাখালদের বড় ভালবাস তাহাদের সাথের সাথী ব্যথার ব্যথী তুমি, কত রাখালের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়াছি—বিফলে। কত রজনী বসিয়া বসিয়া তোমার প্রতীক্ষায় অবিদিতভাবে চলিয়া গিয়াছে, আমার নয়নে নিদ্রা নাই, পলক নাই। কখন তুমি আসিবে,

রহিয়াছি। সে কি উৎকণ্ঠা, বাহিরে একটু শব্দ হইলেই মনে হইত এই বুঝি আসিলে, এই বুঝি আসিলে; হতাশ হইয়া সে কি ক্রন্দনেই আমার এই দীর্ঘ রজনী কাটিয়া গিয়াছে। কত যতন করিয়া প্রাণের আবেগে মনের উল্লাসে তোমার শয্যা রচনা করিয়াছি. ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া শয্যা অনুসন্ধান করিয়াছি, তুমি এস নাই বন্ধু, এস নাই। কত রকমের রঙ্গিন ফুল, যে যে ফুল তুমি ভালবাস, কুঞ্জ হইতে চয়ন করিয়া আনিয়াছি, বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মালা গাঁথিয়াছি তোমায় পরাইব বলিয়া, তোমায় সাজাইব বলিয়া, দীপ জ্বালিয়া বসিয়া রহিয়াছি, আমার ক্ষুদ্র কুটির ফুলে ফুলময় করিয়া রাখিয়াছি, "কুসুম শয়নে নয়নে নয়নে" সারারাতি কাটাইব বলিয়া, শয্যায় কত সুগন্ধ পুষ্পই যে ছড়াইয়াছি; কত চন্দন ঘসিয়া রাখিয়াছি তোমার শৃঙ্গারের আশে; হায় আমার সকলই বৃথা। ফুল আমার বাসি হইয়া গেল, তুমি আসিলে না, চন্দন আমার শুষ্ক হইয়া গেল তোমার দেখা পাইলাম না। যে ফলটী মুখে ভাল লাগিয়াছে তাহাই রাখিয়া দিয়াছি তুমি নবনীত ভালবাস ঐ দেখ কতদিনের মাখন গলিয়া গিয়াছে, ঐ দেখ আমার ঘরভরা কত ফল শুকাইয়া গিয়াছে, পচিয়া গিয়াছে। রজনীতে কত বেশ করিতাম, কত সাজিতাম; প্রভাতে নয়নের জলে আমার সে বেশ দূর করিতে হইত, আমার সে কুঞ্জ রচনা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইত, আমার সে গাঁথা ফুলের মালা যমুনার জলে ভাসাইয়া দিতে হইত। তুমি এলে না বন্ধু এলে না। হা ধিক্ আমায়, আমি তোমায় পেলেম না। এস বন্ধু এস, তোমার বসনাঞ্চলে আমার নয়ন মুছাইয়া দাও।

অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, কোথায় তোমাদের সে রাধা সে কৃষ্ণ যাঁ'দের চারিধার ঘেরিয়া তোমরা সকল সখী মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া বেড়াইতে। তাঁদের সম্ভোগে তাঁদের মিলন মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে তোমরা। লীলাচঞ্চলা, বিলাস বিহ্বলা ব্রজসখি, কোথায় তোমাদের সেই কৃষ্ণ, একবার দেখাও। আর যে পারি না, মনে আরতো মানে না, প্রাণ আরতো বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। একটীবার দয়া কর, দীন বলিয়া—তোমাদের চরণের চিরদাসী বলিয়া একটী বার মুখ তুলিয়া চাও; সে মহামিলনের মধুরোজ্জ্বল আলোকে আমার হৃদয় মন তৃপ্তির মদিরায় ভরিয়া উঠুক; দেখাও সে ছবি, একটীবার, শুধু একটীবার।

জ্যোছ্‌নার আলোকে আজ ভূলোক প্লাবিত হইয়াছে, কুসুমের সুবাসে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত হইতেছে, যমুনা আজ একি মধুর ধ্বনি আরম্ভ করিয়াছে, অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে। কে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী নারী, আপন আলোকে পথ আলোকিত করিয়া আমার মন্দিরাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ? কি বলিতেছ তুমি? প্রাণ স্থির হও, মন আনন্দের আতিশয্যে ফাটিয়া পড়িও না, কর্ণ অবশ হইও না, শোন—

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দন চঞ্চলকরযুগশালী॥
রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং॥
নাম সমেতং কৃত সংকেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং।
বহুমনুতে নম তে তনুসঙ্গত পবন চলিতমপি রেণুং॥

আমায় তিনি ডাকিয়াছেন, তাই তুমি জানাইতে আসিয়াছ ? সখি, আনন্দে আমার তনুমন অবশ হইয়া আসিতেছে, তুমি আমার হাত ধরিয়া লইয়া চল। আজ আমার অভিসার। ধীরে সখি ধীরে, চরণ আমার কম্পিত হইতেছে, আমি যে চলিতে পারি না, নয়ন আমার জলে ভরিয়া আসিতেছে, আমি যে পথ দেখিতে পাই না, কণ্ঠ আমার শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, আমি যে কিছু বলিতে পারিতেছি না—ধীরে সখি, ধীরে।

মরি! মরি! কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর! ধন্য আমার সকল জন্ম, ধন্য আমার সকল কর্ম্ম! কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর!

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদ তিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং॥
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা।
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্"॥

"মার স্বয়ং নু মধুর দ্যুতি মণ্ডলং নু।
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু॥
বেণীমৃজোন্নু মম জীবিতবল্লভোনু।
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়"॥

কিবা সাক্ষাৎকাম দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান

কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।

কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা জীবিতবল্লভ

সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥

কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর!—

"চূড়ক চূড়ে ময়ুর শিখণ্ডক

মণ্ডিত মালতী মাল।

সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত

চৌদিকে করত ঝঙ্কার॥

সজনি! কো কহে কাম অনঙ্গ।

কেলিকদম্ব তলে সো রতি নায়ক

পেখলু নটোবর ভঙ্গ॥

কতহু বিষম শর নয়ন তূণ ভর

সন্ধুক ভাঙ কামানে।

নাগরি-নারি— মরম মাহা হানই

লখই না পারই আনে॥

শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল

দোলত মকর আকার।

গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল

মদনমোহন অবতার॥

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ—কি মনোহর, কি মধুর !—

"রমণী রমণ বর গতি মদমন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ।
মৃগমদ চন্দন তনুঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ॥"
"ভুবনমোহন ঠাম দেখিয়া কান্দয়ে কাম
করুণায় কান্দে কুল-ধনি।"

কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর—— !

স্বার্থক জন্ম, সার্থক জীবন, আনন্দম্—
পরিপূর্ণমানন্দম্—ওঁ হরিঃ হরি ওম্।

—+—

সমাপ্ত।

প্রকাশক—
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র সাহা
রাজকুলবাড়ীয়া, ঢাকা।
১ম সংস্করণ।

—•—

ঢাকা পাটুয়াটুলী, সখা প্রেসে—
শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস দ্বারা মুদ্রিত।